চতুর্থ অধ্যায়
অন্নদাশঙ্কররের ছড়া ঃ আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য

অন্নদাশঙ্করের ছড়ার মূল উৎস বাংলার লোকছড়া। লোকছড়ার মতো তাঁর ছড়াগুলি সহজ সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত। এছাড়াও রয়েছে ধ্বনিগুণ সমৃদ্ধ এক অপূর্ব চিত্রময়তা। লোক ঐতিহ্যকে বহন করে সমসাময়িক চিন্তা চেতনাকে তুলে ধরে স্থাপন করেছেন ছড়ার কাঠামো। বাংলাদেশের নিজস্ব চিত্র ও ধ্বনি তাঁর ছড়ায় প্রতিফলিত হয়েছে। অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়ে শক্তিশালী পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে সনাতন ছড়ার আদলের মধ্যে তিনি বাংলাদেশকেই রোপন করেছেন। তাঁর ছড়ার আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় ছড়াগুলি যেমন ঐতিহ্যনির্ভর তেমনি গল্পরস সমৃদ্ধ। লৌকিক ছড়ার প্রেরণায় ছড়া লিখতে গিয়ে তাঁর ছড়ায় একদিকে যেমন শব্দ ধ্বনি ছন্দের গুরুত্ব আমরা দেখতে পাই তেমনি পাই বিদেশী আঙ্গিকেরও কিছু কিছু নিদর্শন। ধীমান দাশগুপ্তের দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আঙ্গিকগত বৈচিত্র্যের প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য — ''আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য বলতে কত বিচিত্র আঙ্গিকে ছড়া লেখা দেখা যায়। যেমন লিমেরিক। যেমন ক্লোরাহিউ। যেমন রূথলেস্ রাইম। যেমন ব্যালাড, যেমন ছড়া নাটিকা ইত্যাদি। সুতরাং এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় তাঁর ছড়ায় অঙ্গিকগত বৈচিত্র্য কত বিস্তীর্ণ।''১

অন্নদাশঙ্করের রচিত ছড়াগুলি রীতিমতো শিল্পকর্ম। এগুলির ভাবে-ভাষায় ও ছন্দে সর্বত্রই শিল্পীর নিজস্ব হাতের ছাপ। বলার ভঙ্গিতে হাল্কা, কিন্তু ভাবে ভারী। শিল্পগুণ বজায় রেখে তিনি তাঁর রচনার ছন্দ ও বলার ভঙ্গিকে যথাসম্ভব মুখের ভাষার কাছাকাছি নিয়ে গেছেন। ছন্দগুলি স্বকীয়তায় বিরাজমান। এ বিষয়ে ধীমান দাশগুপ্তের দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তাঁর উক্তিটি লক্ষ্য করলে বিষয়টি আরো পরিস্কার হয়ে ওঠে। সেখানে তিনি বলেছেন —''আমার কাছে আদর্শ ছড়া ছিল, 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে', 'খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো', হাট্টিমা টিম টিম' এইসব - খাঁটি লোকসংস্কৃতি, মুখে মুখে যা ছড়িয়ে পড়ে, পুরুষানুক্রমিক যা সঞ্চারিত হয়। একদিকে এই আর একদিকে হিউমরাস বা ননসেন্স কিছু। এইসব লোকছড়ায় কতদিনের অভিজ্ঞতা, ফোকউইস্ডম ধরা থাকে। এ ছাড়া নানান সম্প্রদায়ের ছড়ায় নানা এথ্নিক ব্যাপারও থাকে। আধুনিক ব্যঙ্গ বা সূক্ষ্ম কল্পনার চেয়ে আমি চেয়েছিলাম ছড়ার মধ্য দিয়ে সাধারণের জন্য বলতে।

এমনিতে কবিতার মতো ছড়ার কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম নেই, ছড়া বানাবার। ছড়া হয় আকস্মিক, ইররেগুলার। সেখানে আর্ট আছে আর্টিফিসিয়ালিটির স্থান নেই। ছড়া হবে ইররেগুলার, হয়তো একটু আনইভেন। বাকপটুতা, কারিকুরি নয়। কবিতা থেকে ছড়া আলাদা। ছড়াকে কবিতার মধ্যে ঢোকাতে গেলে কবিতাকে ব্যপ্ত করে নিতে হয়। কবিতা তো যে কোনো ভাবেই হয়, যে কোনো ছন্দে এমনকি গদ্যেও। ছড়ার কিন্তু একটাই ছন্দ। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন

ছড়ার ছন্দ, একটু দুলকি চালে চলে, শাস্ত্রসম্মত নাম ও একটা আছে তার। ছড়া ঐ ছন্দেই লেখা যায় শুধু। আমি ওতেই লিখেছি মূলত। হয়তো কোথাও কোথাও অন্যরকম করেছি, কিন্তু আসল ছন্দটা ওই। আর ছড়ার মিল দু সিলেবল হবেই, তিন সিলেবল হলে আরোও ভালো হয়। আর শেষে কোনো যুক্তাক্ষর থাকবে না।'' ২

অন্নদাশঙ্করের ছড়ার আঙ্গিকগত কাঠামো নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েও আমরা দেখতে পাই মূলতঃ ছড়ার যে পরম্পরাগত ছন্দ তথা দলবৃত্ত ছন্দকেই তিনি বেশি করে অবলম্বন করেছেন। এছাড়া তাঁর কিছু ছড়ায় মিশ্রবৃত্ত ছন্দেরও পরিচয় মেলে। মূলত ছোটোদের জন্য লিখেছেন বলে। বড়োদের জন্য লিখলেও সাধারণ পাঠকই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। যে কারণেই তিনি খুব বেশি চোখে ধাক্কা দেওয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে যাননি। সংগতভাবে মিলের উপর ভিত্তি করে মিলকে নিয়ন্ত্রণ রেখেই তিনি ছড়া রচনা করেছেন। কখনো কখনো ছন্দের প্রয়োজনে শব্দকে ভেঙেছেন কখনো বদলেছেন আবার কখনো কখনো বিবৃতি ও মন্তব্যের বাইরে গিয়ে ভাষার কারিগরি দক্ষতাকে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর লিমেরিক জাতীয় ছড়াগুলিতে এই মিলের বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়।

যেমন — এরকম কয়েকটি ছড়া —

১.
এক যে ছিল হনুমান
এটা আমার অনুমান।
তার যে ছিল ছানা
এটা আমার জানা।
লঙ্কাকান্ড দিনমনে।

২.
এক যে আছে পেয়ারা গাছ
পাড়ার শিশু তারই কাছ'
পাড়া যখন শুতে যায়
বাদুর এসে পেয়ারা খায়।
গাছ রে তুই ফুরিয়ে বাঁচ।

৩.
বাঙালীই বটে টমবাবু
ছেলেটি কি তাঁর কম বাবু!
এই বয়সেই বৎস
সারাবেলা ধরে মৎস্য।
বলিহারি তার দম, বাবু! (ডালিম গাছে মৌ)

বিদেশী আঙ্গিকে এই ছড়াগুলি রচিত। এখানে চার-পাঁচটি চরণ নিয়ে ছড়া গঠিত হয়। এগুলি আকারে খুব ছোট। এখানে ছড়ার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই তাৎপর্যটি মূলত মিলগত। ছড়াগুলি শুনে বা পড়ে শিশুদের তো বটেই, সেই সঙ্গে সাধারণ পাঠকের কাছেও খুব তৃপ্তিদায়ক হয়ে ওঠে।

বিদেশী আঙ্গিকে গঠিত এই লিমেরিক জাতীয় ছড়ার সংখ্যা খুব কম। ক ক খ খ ক মিলের পাঁচ পংক্তি র এই বিদেশী আঙ্গিকটি ইউরোপীয় ছড়ার অন্যতম প্রধান বিষয়।

তাঁর বিদেশী আঙ্গিকে রচিত বিখ্যাত ব্যক্তির নাম নিয়ে লেখা ক্লেরিহিউ ছড়ার নিদর্শন আমরা দেখতে পাই। এই ছড়াগুলির সংখ্যা কম। 'উড়কি ধানের মুড়কি' তে তাঁর এরূপ কয়েকটি ছড়া আমরা দেখতে পাই। এই ছড়াগুলি যথাক্রমে —

১. আচার্য জগদীশ বসু
উদ্‌ভিদকে বলেছেন পশু।
নতুন কথা এমন কী
অবাক হওয়াই আশ্চর্য্যি!

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
এবার যাচ্ছেন পাকুড়।
চায়না কিংবা পেরু না
সেইখানেই তো করুণা।

৩. শরৎচন্দ্র চাটুয্যে
মৌন আছেন মাধুর্য্যে
সৃষ্টি এখন সবাক তাঁর
মঞ্চপর্দা বেবাক তাঁর।

৪. পন্ডিত জবাহর লাল
নীলকে করবেন লাল
তা শুনে ভাবে যত নীল
কান যে নিয়ে যায় চিল।

৫. শ্রীমান্ সমরেশ সেন
পড়েছি যা লিখছেন।
মনে হয় সমরেশ সেন
লিখেছেন যা পড়েছেন।

৬. শ্রীমতি অনামিকা দে
কেমন মধুর নাচে সে।
সব কটি ভালো ভালো মে'
সকলের হয়ে গেছে বে।

(উড়কি ধানের মুড়কি)

বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে লেখা এই ছড়াগুলির প্রধান বিষয় মিল। আলোচ্য ৬ নং ছড়াতে শেষদুটি পংতিতে 'মে' এবং 'বে' শব্দ দুটি ইউরোপীয় আঙ্গিকের একটি প্রধান মাধ্যম। এখানে পুরো শব্দটি 'মেয়ে' এবং 'বিয়ে' ব্যহার না করে 'মে' এবং 'বে' শব্দদুটি ব্যবহার করে ধ্বনিগত মিলের সাদৃশ্য চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর এই ছড়াগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য বিখ্যাত নামী ব্যক্তিদের নিয়ে রচনা করা। এখানে নামীব্যক্তিবর্গের বিশেষ কিছু দিক ছড়ার মাধ্যমে অল্পকথায় পরিবেশিত হয়েছে।

এই ছড়াগুলি ছাড়াও পরবর্তীকালে অন্নদাশঙ্কর অখ্যাতনামাদের নিয়ে চারটি নতুন ধরণের ক্লেরিহিউ রচনা করেছেন।

যেমন —

১. মেয়ে আমার আদুরী
নোটনরানী ভাদুড়ী।
একাই নাচে একাই গায়
একটি জনের সম্প্রদায়।

২. ছিল তখন চৌধুরী
লক্ষ্মীদুলাল চৌধুরী
আছে এখন লালবাতি
আড়াই কুড়ি নাতনাতি।

৩. না আঁচালে নাই বিশ্বাস
বংশীবদন বিশ্বাস
তবু যাই তাঁর উৎসবে
দৈনিকে নাম ছাপা হবে।

৪. ধন্য তোমার এনার্জি
চিত্তচকোর বেনার্জী।
হারতে হারতে হারাধন
করছো নতুন দল গঠন।

(উড়কি ধানের মুড়কি)

এই নতুন ধরনের ''ক্লেরাহিউ'' জাতীয় ছড়াগুলি মূলত আখ্যাত নামাদের নিয়ে রচিত। অখ্যাত নামাদের নিয়ে রচিত হলেও ছড়াগুলির মধ্যে বিশেষ বিশেষ কিছু চিত্তাকর্ষক দিক রয়েছে। কিন্তু এই বিদেশী রীতির অনুরাগ দীর্ঘদিন তাঁর মধ্যে ছিল না। যে কারণেই বিদেশী আঙ্গিকের রীতিতে গঠিত এ ধরণের ছড়ার সংখ্যা কম।

এছাড়াও তাঁর বিদেশী আঙ্গিকে রচিত আর এক ধরণের ছড়া রুথলেস্ রাইম। বিদেশী আঙ্গিকের রীতিতে বাংলা ছড়ার প্রথম রূপকার অন্নদাশঙ্কর রায়। ছড়ার মধ্যে রূপায়িত করলেন নতুন নতুন আঙ্গিক, যা তাঁর ছড়াকে কালত্তীর্ণ করে তুলেছে। রুথলেস্ রাইম তাঁর একটি অন্যতম আঙ্গিকগত গুণ। যেমন —

১. ছোটগল্প পাঠিয়েছিলেন
শ্রী হারাধন কারফর্মা
ছাপতে গিয়ে দেখা গেল
লেখা হলো চার ফর্মা।
সম্পাদক শ্রী সেনশর্মা
চালিয়ে দিলেন করাৎ
লেখা হলো চার পৃষ্ঠা
পাঠক ,তোমার বরাত।

২.

হটাৎ বলল ফেমিনিস্ট
ও পড়ার ওই বিশে
পিসীকে ডাকল পিসে।
খবর পেয়ে গেলেন ক্ষেপে
চন্ডীচরণ চাকী
কাকাকে ডাকলেন কাকী। (উড়কি ধানের মুড়কি)

শিশুর কান ধ্বনিশোষক। এরা এই ধ্বনির মধ্যে নিয়ে অপরিচিত জগৎকে অনুভব করার চেষ্টা করে। ফলত ধীরে ধীরে অচেনা জগৎও তার কাছে চেনা জগৎ হয়ে যায়। ঠিক এই ভাবেই বিদেশী রাইমের ধ্বনিতেও তার কান অভ্যস্থ হতে থাকে, যেখানে সে ভালোবাসার প্রেরণায় এ দেশের মানুষকেও বুঝতে পারে। শুধুমাত্র শিশুকল্পনাকে উদ্দীপ্ত করার জন্যই এই ছড়াগুলি রচিত হয়নি, রচিত হয়েছে বাংলার জলহাওয়া মেশানো ধ্বনিময় ও চিত্রময় দৃশ্যগুলিকে মনে বন্দী করতে।

২. 'ব্যালাড' নিয়ে ও অন্নদাশঙ্করের একটি চিন্তা যে মাথায় ঘোরাফেরা করত তাও বোঝা যায় তাঁর উক্তি থেকে। 'কিশোর সঞ্চয়ন' গ্রন্থের অন্তিম দুটি বাক্যে তিনি লিখেছেন —'আমার ধনুর্ভঙ্গ পণ ব্যালাড আমি একদিন লিখবই। যদি ছেলেমানুষ হতে ভুলে না যাই।' অন্নদাশঙ্কর ছিলেন ঐতিহ্য নির্ভর এবং গল্পরসের কাহিনীর অনুরাগী। যে কারণে তাঁর ছড়ায় ঐতিহ্যনির্ভর কাহিনীর নবরূপায়ন ঘটিয়েছেন তাঁর ব্যালাড জাতীয় ছড়াগুলিতে। যেমন —

আগডুম রে বাগডুম রে সাজলো রে ঘোড়াডুম
ঘোড়াডুম।
সাজলো রে বাজলো রে ঢাক তাক তাক ডুমাডুম
ডুমাডুম।
ঢাক তাক তাক ঢাকাই ঢাক তাক তাক খুলনাই
খুলনাই।
ঢাকীরা মূলতানি সুলতান — ভুল নাই
ভুল নাই।
বাজতে রে বাজতে রে চললো রে দৌড়ে
দৌড়ে।
সপ্তদশ অশ্ব পৌঁছলো গৌড়ে
গৌড়ে।
গুড় দিয়ে চা খায় রে গৌড়েরি লোকজন
লোকজন।
চিনির সাধ মিটবে রে জিতলে নির্‌বাচন
বাচন।

কোন দিন তা আসবে রে এই তার এক মামলা
মামলা।
এমন যে সময় রে বাধলো রে হামলা
হামলা।
এবারকার শতকটা দ্বাদশ নয় বিংশ
বিংশ।
গৌড়ের এই লোকজন যে নয় খুব অহিংস
হিংস।
মুলতানী সুলতানী হাঁক শুনে হায় রে
হায় রে!
লাফ দিয়ে উঠলো রে ছুটলো রে বাইরে
বাইরে
জুটলো রে গাড়ওয়ালী মাড়ওয়ারী রক্ষক
রক্ষক।
গৌড়ের ওই গুড়টুকুর সিংহের ভাগ ভক্ষক
ভক্ষক।
আগডুম রে বাগডুম রে থামলো ঘোড়াডুম
ঘোড়াডুম।
সাজলো না, বাজলো না, ঢাক তাক তাক ডুমাডুম
ডুমাডুম

আটান্নর হামলা, (উড়কি ধানের মুড়কি)

রূপকথার গল্পনির্ভর রচনা এখানে আধুনিকভাবে ব্যক্ত হয়েছে। প্রত্যেক স্তবকের একটি করে দ্বিতীয় পংক্তিতে পুনরুক্ত। এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ যা সম্পূর্ণ আঙ্গিকগত দিক থেকে নতুন। এই ব্যালাডটি অন্নদাশঙ্করের প্রথম রচিত।

অন্নদাশঙ্করের আরেকটি সার্থক ব্যালাড জাতীয় ছড়া —

এক যে ছিল রাজা
এক যে ছিল রাজা দেয় না সাজা লোকটি ভালো বেজায়
একদা ঘোর বনেতে নির্জনেতে থাকবে বলে সে যায়।
তারপর খবর নেই
তারপর খবর নেই ব্যাপার এই রাণীকে ভাবিয়ে তোলে
তা শুনে উজীর বুড়ো নাজীর খুড়ো পড়ল গন্ডগোলে।

রাজাদের অশ্বশালায় সন্ধানে যায় আছে কী তাজী ঘোড়া?

সে ঘোড়া চড়তে জোয়ান কে আগুয়ান পাবে তোড়া।
একটা ছিল বাজী
একটা ছিল বাজী আরবী তাজী চেহারা বেবাক শাদা
সে ঘোড়ার লায়েক সোয়ার মেলা যে ভার। চড়লে পড়বে দাদা।
তা ছাড়া বাঘের ডরে
তা ছাড়া বাঘের ডরে দিন দুপুরে পথে চলতে মানা
তাই তো হয় না জোয়ান কেউ আগুয়ান, করে সব টালবাহানা!
ছিল এক বিশ্বাসী জন
ছিল এক বিশ্বাসী জন রাজার আপন, সে বলে আচ্ছা রাজী
বাঁচি বা পড়ি মরি ঘোড়ায় চরি কেয়াবাৎ আরবী তাজী
যেখানে বাঘের ভয়, (ডালিম গাছে মৌ)

ব্যালাড জাতীয় রচনাটি পড়তে হলে কোথায় থামতে হবে - কোথায় ছুটতে হবে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন এভাবে —

এক যে .... ছিল রাজা দেয় না সাজা .... লোকটি ভালো বেজায়
একদা ..... ঘোর বনেতে নির্জনেতে থাকবে ..... বলে সে যায়।

এটিকে কোন সুরে, কিভাবে পড়তে হবে তার নির্দেশ নিয়ে তিনি আঙ্গিকগত ভাবনাটি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। অন্নদাশঙ্করের ছড়ার মূল উৎস লোকছড়া। লোক ছড়ার ঐতিহ্যকে বহন করে তাঁর মননশীলতা ও কল্পনার মেলবন্ধনে শিশুদের চিত্তাকর্ষক করে আধুনিক ভাবনায় এই ছড়াটি তিনি নির্মান করেছেন ।

এরকম বেশ কিছু ব্যালাড জাতীয় রচনা আমরা দেখতে পাই তাঁর লেখনিতে। তাঁর আরেকটি এ জাতীয় রচনা —

সুয়ো যে রাণী ছিল সোনার মঞ্জিলে
দুয়ো যে রাণী ছিল বনে
একদা কী করিয়া মিলন হলো দোঁহে
কী ছিল ভূপতির মনে!
ভুপতি বলে, শোন তোমরা দুই বোনে
প্রাসাদে মিলে মিশে রহ
আমিই বনে যাই যাবার আগে তাই
ভবন দান করি, লহ।
সুয়ো যে রাণী বলে, না —

চাহি না এক সাথে থাকা
আমারে আলহিদা মহল নিয়ে যাও
পাঁচিল গড়ে দাও পাকা।

দুয়ো যে রাণী বলে, না —
পাঁচিল গড়া হবে নাকো
তোমার না পোষায় যেথায় খুশি যাও
পোষায় যদি তবে থাকো।

দুই রাণী (উড়কি ধানের মুড়কি)

এই ব্যালাড জাতীয় রচনার মুখ্য প্রকরণ হল কাহিনী এবং সঙ্গীতধর্ম। সুনির্দিষ্ট একটি গল্পকে অবলম্বন করেই এই বিশেষ লোককথাটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। আর সেই গল্পটি সুরের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। সুতরাং গীতিধর্মই ব্যালাডের প্রাণশক্তি। লোককথা হবার সূত্রে বিভিন্ন ধরণের লোকায়ত সুরের প্রকরণেই এগুলি গাওয়া হয়, এগুলির রচয়িতরা তাঁদের নিজস্ব কিছু বাগভঙ্গী, শব্দপ্রযুক্তি, চিত্রকল্প, ভাবনা ইত্যাদি সর্বদাই নানাভাবে সৃষ্টির মধ্যে ব্যবহার করেন। ব্যালাডের এই প্রাণশক্তিকেই তুলে ধরেছেন তাঁর ছড়ার আঙ্গিকগত রূপান্তরের মাধ্যমে।

ছড়ার মধ্যে খেলার ছলে বাংলার ছেলে মেয়ে, পশু-পাখী, ঘর- বাড়ি, অসন-বসন, আচার-ব্যবহার সমস্তই কখনো ছবির মতো আঁকা, কখনো পুতুলের মতো গড়া, কখনো গল্পের মতো, কোনটা নাটকের আকারে- পরিবেশিত হয়েছে। অন্নদাশঙ্করের কিছু কিছু ছড়া এক একটা ছোট নাটকে পরিণত হয়েছে। যেমন —

খোকা । বাঘ সিংহের লড়াইতে কে জিতবে সার?
শিক্ষক । তুমিই বলো, শুনতে চাই উত্তর তোমার।
খোকা । সিংহই তো বনের রাজা, রাজশক্তিধর
সিংহই জিতবে রণে, আমার উত্তর।
শিক্ষক । বুদ্ধি যার বল তার, শাস্ত্রের বচন
সিংহ নয় বুদ্ধিমন্ত বাঘের মতন
বলে না জিতুক বাঘ জিতবে কৌশলে
সিংহ তো নামেই রাজা, বাঘই আসলে।
অভিমানে সিংহ গেছে বাকী ভারত ছেড়ে
লুকিয়ে আছে গুজরাতের শুধু একটি টেরে।

বাঘসিংহের লড়াই
(সাত ভাই চম্পা)

আলোচ্য ছড়ার গান নাটকীয় সংলাপে বর্ণিত হয়েছে। একটি আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ ছড়ার দুটি অংশ থাকে। প্রথমটি মৌলিক প্রতিসাম্য আর দ্বিতীয়টি সম্পূরক প্রতিসাম্য। ছড়ার সূচনাত্মক চরণটিকে মৌলিক প্রতি সাম্য রূপে গণ্য করা হয়। আর এটিকে অনুসরণ করেই পরবর্তী চরণগুলি রূপায়িত হয়। ছড়াটিতে কল্পনার আশ্রয় রয়েছে, কিন্তু খেয়ালিপনার স্থান নেই। যা থেকে ছড়ার মৌলিক রূপটি ফুটে ওঠে।নাটকীয় সংলাপে রচিত এরকম অনেক ছড়া পাওয়া যায়। যেমন এরূপ আরেকটি ছড়া —

বাজিকর। এই দেখ দুই হাত খালি
এই দেখ দুই হাত মুঠো
এই দেখ দুই মুঠো খোলা
উড়ে গেল বুলবুলি দুটো,
খোকা । তাজ্জব!
বাজিকর । এই দেখ দুই চোখ বাঁধা
এই দেখ দুই চোখ খোলা
দু চোখের দুইটি গোলক
হয়ে গেল সোনার দুটি গোলা।
খোকা । তাজ্জব! ভোজবাজি (সাত ভাই চম্পা)

শিশুর কল্পনা জগতে যা রচিত হয়, সেটাই সত্য। তাই প্রত্যক্ষ জগৎ পরিণত মানুষের কাছে যতটা সত্য, ছড়ার স্বপ্নজগৎ নিত্য স্বপ্নদর্শী বালকের কাছে তার চেয়ে অনেক বেশি সত্য। যে কারণে রচয়িতা ও শিশুমন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। উপরিউক্ত ছড়াটিতে বাজিকরদের যাদুমন্ত্র শিশুদের কাছে অতি রোমাঞ্চকর হয়ে উঠেছে। যা সংলাপের আকারে পরিবেশিত হয়েছে এবং শিশুমনের প্রভাবে প্রাপ্তবয়স্করাও শিশুর সঙ্গে উপভোগ করে পৌঁছে যান শৈশবের দিন গুলিতে। এখানেই রচয়িতার স্বার্থক।

গঠনগত দিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় অন্নদাশঙ্করের ছড়া শুধু সংলাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর কিছু কিছু ছড়ায় নাটকীয় ভঙ্গিতে দৃশ্যের উপস্থাপনাও ঘটেছে। যেমন —

প্রথম দৃশ্য । রেলস্টেশন
সত্যচরণ মুস্তাফী মাল গুনতি করছেন, এমন সময় শম্ভুচরণ দে এলেন।

শম্ভু । ইস্টিশনে করছ কী?
সত্যচরণ মুস্তাফী ?

সত্য । আরে, কে?
শম্ভু দে ?

দ্বিতীয় দৃশ্য । রাস্তা
শম্ভুচরণ দে ছুটছে! কুঞ্জ পাল উল্টো দিক থেকে আসছে।

কুঞ্জ। হন্‌হনিয়ে যাচ্ছে কে ?
শম্ভু দে ?

শম্ভু । বলব কী ভাই, কুঞ্জ পাল
দেখবে চোখে আপনি কাল!
বাঁকুড়াতে পৌষ মাস
গড়বেতায় সর্বনাশ।

তৃতীয় দৃশ্য । মাঠ
রাখাল গরু চড়াচ্ছে। কুঞ্জ পাল দৌড়াচ্ছে।

রাখাল । কী হয়েছে। বল না ?
করছ কেন ছলনা ?

কুঞ্জ । মাথায় তোর গোবর
শুনিস নি সে খবর ?
গড়বেতায় বোমা .....

চতুর্থ দৃশ্য । রাস্তা
রাখাল গরু বাছুর নিয়ে যাচ্ছে। ভূতনাথ বাগ্‌দী দেখে বলছে —

ভূতনাথ । গোরু বাছুর ছাগল নিয়ে
চলল কোথায় ? পাগল কি এ!

রাখাল। পাগল নয়গো ঘোষের পুত
বুঝবি কী তুই বাগ্‌দী ভূত!

জনরব (রাঙা ধানের খৈ)

আলোচ্য ছড়াটিতে নাটকের দৃশ্য সজ্জার মতো, প্রথম দৃশ্য, দ্বিতীয় দৃশ্য, চতুর্থ দৃশ্যের স্থান, কাল, নির্ণয় করা হয়েছে। নাটকের সংলাপের মতোই বেশ কয়েকটি চরিত্র অঙ্কন করে তাদের সংলাপের মাধ্যমে ঘটনাকে তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জাপানের অগ্রগতির ফলে আতঙ্কিত ভারতবর্ষের চিত্র তুলে ধরেছেন ছড়াতে। জাপানীরা সমুদ্রপথে এসে মেদিনীপুরের সমুদ্রোপকুলে আস্তানা গড়ে তোলে এবং ভারতবাসীদের বিশ্বযুদ্ধের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে অংশ নেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব দিতে থাকে। অন্নদাশঙ্কর এই বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাকেই তাঁর ছড়ায় নাটকীয়সুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন। যেখানে রয়েছে বিভিন্ন চরিত্র, বিভিন্ন সত্য ঘটনার বিবরণ। এরকম বিভিন্ন ছড়ায় নাটকীয় সংলাপ লক্ষ্য করা যায়। ''দুই বেড়াল ও এক বাঁদর'' তাঁর উল্লেখযোগ্য আরেকটি ছড়া।

আধুনিক কালের বিখ্যাত ছড়াকারদের মধ্যে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায় যাঁদের প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বী নেই বললেই চলে, তাঁদের ছড়ায় রয়েছে বিভিন্ন মজার গল্প, রয়েছে ধ্বনি, মিলের চমক। অন্নদাশঙ্করের কাছে এঁরা কেউ তাঁর আদর্শ নন। তাঁর আদর্শ যোগীন্দ্রনাথ সরকার। কারণ যোগীন্দ্রনাথের ছড়ায় রয়েছে এক সহজ প্রকাশভঙ্গি প্রায় শিশুর ভাষার মতো সরল এবং বাংলাদেশের জলবায়ুর একটা ঝাপট। তাই রবীন্দ্রনাথের ইনটেলেকচুয়াল শিশুর পরিবর্তে অন্নদাশঙ্কর ছুঁতে চেয়েছেন শিশুর কল্পনাকে বাংলাদেশের লৌকিক প্রচ্ছেদে, প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায়, যেগুলি শিশুর রসাস্বাদনের পক্ষে ঈষৎ ভারি না হয়ে অনেকটা সহজতর হয়ে উঠেছে।

প্রথম জীবনে অন্নদাশঙ্কর ''উড়কি ধানের মুড়কি'' সংকলন প্রকাশের সময় ঐ গ্রন্থে কেবল বড়োদের জন্য লেখাই সংকলন করেছেন। লেখকই লিখেছেন ''উড়কি ধানের মুড়কি'' যেমন বড়োদের ছড়ার বই ''রাঙা ধানের খৈ'' তেমনি ছোটদের। অর্থাৎ বড়োদের ছড়া ও ছোটদের ছড়া এই শ্রেণী বিভাগ লেখকের নিজের। অথচ 'কিশোর সঞ্চয়নে'র ছোটদের জন্য লেখা' নিবন্ধের শুরুতে অন্নদাশঙ্কর বলেছেন — '' ছোটদের জন্য লেখা ও বড়োদের জন্য লেখা একই কলমেই লেখা। যে লেখে সে একই মানুষ। তার মানসে বা হৃদয়ে পরিচ্ছন্ন ভাগ নেই। যারা পড়ে তাদের ও কি স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত করা যায় ?'' ৩ লেখক একজনই, তাঁর মানসে দুটো আলাদা পরিচ্ছন্ন ভাগ নেই, ঠিক কথা। মানসের ভাগ ও পরিচ্ছন্ন নিশ্চিতভাবেই নয়, ছড়া লেখার মানসিকতাও এক, তবু মেজাজ আলাদা, যারা পড়ে তাদের স্বতন্ত্রভাবে ভাগ করা যায় না, অবশ্যই — কিন্তু তবু তারা দুই ভাগে বিভক্ত। তাঁর বড়োদের ছড়ায় যে সমাজমানস কাজ করে, ঈষৎ ব্যঙ্গ কখনো বা সহানুভূতি, তা শুধু ধ্বনি মিল বা চিত্রে উদ্ভাসিত নয়, কিন্তু শিশুর মনে এই টুকুই ছুঁয়ে যায় মাত্র। অপরদিকে বয়স্ক পাঠকের সামনে অর্থের একটা আলাদা মাত্রার দরজা খুলে দেয়। অর্থসংযুক্তির সঙ্গে তার তৃপ্তির মাত্রা বাড়ে। ছড়ার সমস্ত টুকুই আস্বাদ করে নেয় সে। এই বয়স্ক পাঠক যখন ছোটদের ছড়া পড়ে, তখন যে মন তা আস্বাদ করে, সে মন সম্পূর্ণ বয়স্ক পাঠকের নয়। তার মধ্যে সুপ্ত শিশুমন, শৈশবের স্মৃতিজমা অন্য একটা সত্তা।

শিশুর মতোই সে আস্বাদ করে কোন প্রশ্ন না করে, শিশুর মতোই মেনে নেয় সব অসম্ভবকে সম্ভব বলে। এছাড়া ছড়ার মধ্যে যে পারস্পর্যের অভাব থাকে , যা আসলে শিশুর কল্পনা অভিমুখী, তাকেও সে যে মেনে নেয় তা কেবল ক্ষনিকের জন্য শিশুর মনোময় জগতের অধিষ্ঠানের জন্যই। ছোটদের ছড়ার মধ্যে অর্থের অগম্য এক অর্থকে আবিস্কার করে যে তৃপ্তি বয়স্ক পাঠকদের ঘটে, সেটা তার উপরি পাওনা।

শিশুরা অর্থের প্রতীতি নিয়ে ছড়া পড়ে না। বড়োদের ছড়া পড়ে যদি সে তৃপ্তি পায় তাহলেও তা অর্থনৈতিক নয়, ধ্বনি ও চিত্র ঘটিত। অবশ্যই এই চিত্র যদি তার হৃদয়াগম্য হয়। 'রাঙা ধানের খৈ' নামক ছড়ার বইতে দেশবিভাগের বেদনাকে অন্নদাশঙ্কর 'খুকু ও খোকা' ছড়ায় ধরেছেন। বইটি ছোটদের ছড়ার। ''তেলের শিশি ভাঙ্‌ল বলে / খুকুর পরে রাগ করো' এই কথার সঙ্গে বুড়ো খোকার ভারতভাগের সম্পর্ক নিরূপন শিশুর সাধ্য নয়, কৃত্যও নয়। এই ছড়ার সমাজচেতনা ও ব্যাঙ্গ শিশুর আস্বাদের বাইরে। তার কাছে ভাঙাভাঙির খেলা নিছক মজা। তেলের শিশি ভাঙা, ভারত ভাঙা, পাটের আড়ৎ, চায়ের বাগান, কলেজ, থানা, অফিস সর্বোপরি বাঙলা ভাঙা শিশুর কল্পনায় কয়েকটি ছবি মাত্র। এই ছবির ওলট পালট, ভাঙাভাঙির বেদনা, তার স্পর্শের অগম্য। অথচ এই ছড়াটিই বয়স্ক মনে তীব্র আন্দোলন তুলবে।, ক্ষোভ ও বেদনার সঞ্চার করবে। ভাঙাভাঙির কয়েকটি ছবি নয়, সবটাই তার উপলব্ধির মধ্য দিয়ে তকে পৌঁছে দেবে ভারত ভাগের সর্বনাশা পরিণামে। অর্থাৎ ছড়ায় শিশু ও বয়স্কদের রসাস্বাদনের পদ্ধতি আলাদা, সুতরাং এই দুয়ের জন্য লিখিত ছড়া একই কলমে লেখা হলেও স্বাদে আলাদা। আর এখানেই আধুনিক ছড়াকারদের মধ্যে অন্যতম অন্নদাশঙ্কর। যাঁর রচনা এখানেই হয় আঙ্গিকের দিক থেকে অভিনব।

'উড়কিধানের মুড়কি'র ভূমিকায় অন্নদাশঙ্কর বলেছিলেন — 'ছড়া লেখার উপকরণ আসে সমসাময়িক ঘটনা ও পরিস্থিতি থেকে।' তাঁর বড়োদের ছড়ায় এ কথা আক্ষরিক সত্য তবে ছোটদের ছড়ায় সমসাময়িক ঘটনা নেই, পরিস্থিতি নেই এমন নয়, কিন্তু সেখানে সমসাময়িকতা ব্যবহার করেছেন ভিন্নভাবে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাঁর রচিত এই ধরণের ছড়া উদ্ভটের রাজ্য নয়, আজগুবি নয়, বরং সমকালকে ছন্দে ধ্বনিতে ঈষৎ ব্যঙ্গে ধরা। মানসিকতা বিশ্লেষকের, ব্যাখ্যাকারীর। দেশবিভাগ, সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক, বন্ধ্যা রাজনীতি, সমাজব্যবস্থার ফাঁকি, বাংলাদেশ যুদ্ধ — সমকালীন প্রায় সমস্ত ঘটনাকে ছুঁয়ে গেছে। সাময়িক ঘটনা ও পরিস্থিতি তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন নিপুনভাবে, এবং ঐ সব ঘটনা থেকে উদ্ভুত সংকট ও সমস্যা হিউমারাস ভঙ্গিতে ছন্দে মিলে ব্যক্ত করেছেন।
যেমন —

করেছি পণ, নেব না পণ
বৌ যদি হয় সুন্দরী
কিন্তু আমায় বলতে হবে
স্বর্ণ দেবে কয় ভরি। পণ (উড়কি ধানের মুড়কি)

নিজের জবানীতে লেখা এ ছড়ার মজা এই যে, ব্যাঙ্গের ছোবল যেন নিজেরপ্রতিও উদ্যত। সমাজমনস্ক লেখকের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় এতে, অথচ ক্ষিপ্ত হয় না কারো মন।

এই ধরণের অন্য একটি ছড়া —

বাড়ী যদি বর্ধমান
খাবেন সুখে মর্তমান।
বাড়ী যদি হুগলী
খাবেন সুখে গুগলী।
বাড়ী যদি কলকাতা
খাবেন সুখে ওলপাতা।
বাড়ী কি মেদিনীপুর
খাবেন সুখে তালের গুড়। চাল না পেলে
(উড়কি ধানের মুড়কি)

খাদ্য সংকটের দিনে চাল না পেলে কত সুখের খাবার আছে জেলা অনুসারে তারই খাদ্য তালিকা শুনিয়ে দেন আমাদের। 'বর্ধমান'র সঙ্গে 'মর্তমান', 'হুগলী'র সঙ্গে 'গুগলী', 'কলকাতা'র সঙ্গে 'ওলপাতা' সবই হিউমারাস ভঙ্গিতে ছন্দ মিলের চমৎকার দৃষ্টান্ত। হয়তো এ রসিকতা মর্মান্তিক কিন্তু ছড়ার মজায় সবই সহনশীল হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে দেশের সর্বনাশের কারণ যখন বলেন —

দেশের দফা করলে রফা
এ তিন সেন;
পার্টিসেন আর
ইনফ্লেসেন আর
কোরাপসেন। তিন সেন (শালিধানের চিঁড়ে)

ছড়াটি পড়ে বোঝা যায় এ এক অব্যর্থ পর্যবেক্ষণ। ধ্বনিসম্পদে ও অনুপ্রাসের

দোলায় ঈষৎ অন্যমনস্ক হলেও এ তিনের জ্বালা বাঙালী ভুলতে পারে না। বড় সত্যানিষ্ঠ মনে হয় কবিকে, মনে হয় অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ভাবনা। এ ভাবেই যুক্তফ্রন্টের শরিকীবিবাদ তুলে ধরেছেন তাঁর অন্য একটি ছড়ায় —

এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গে ভরা
মাথা থেকে পা অবধি শরিকী ঝগড়া। তবু রঙ্গে ভরা
(শালি ধানের চিঁড়ে)

আবার যুগ্মধ্বনির প্রভাব ঘটিয়ে অপূর্ব ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি করেছেন তাঁর ছড়াতে —

এই ছিল ওরা ধরার বক্ষে
এই গেল ওরা চাঁদের কক্ষে
এই ফিরে এল অক্ষত দেহে
সকলি দেখেছি মুগ্ধ চক্ষে।

ছড়ায় ননসেন্স ভার্সের খুব একটা পক্ষপাতিত্ব অন্নদাশঙ্কর ছিলেন না। সুকুমার রায়ের আজগুবি বা উদ্ভট-জগৎ সৃষ্টি তাঁর ছড়ায় মুখ্য ছিল না। অন্নদাশঙ্করের ছড়ার জগৎ তুলনায় যথাযথ। কখনো লোকছড়া বা রূপকথাকে ব্যবহার করে সমসাময়িক জীবনকে তুলে ধরা, কখনো শব্দ নিয়ে খেলা বা ধ্বনি আর ছবির সমাহারে দৃশ্যজগতের রহস্যকে নিয়ে মজা করা, আবার কখনো ছন্দ আর বলার ভঙ্গিকে কথ্য ভাষায় কাছাকাছি নিয়ে এসে শিশুর অন্তরঙ্গ হয়ে যাওয়া। শব্দই তাঁর ছড়ার মুখ্য অবলম্বন । যেমন —

জব্দিবে কে শব্দকে ?
শব্দ যে যায় সব দিকে।
যতই আসুক দুঃসময়
শব্দ যে যায় বিশ্বময় শব্দী (উড়কি ধানের মুড়কি)

অথবা —

ধুমধড়ক্কা

চল ফরক্কা
দার্জিলিং মেল।

প্ল্যান আঁটব
খাল কাটব
ভগীরথের খেল।

নইলে অক্কা
জয় ফরক্কা
ভানুমতির খেল। ভগীরথের খেল
যাদু এ তো বড় রঙ্গ

উপরিউক্ত ছড়াগুলি থেকে বলা যায় অন্নদাশঙ্করের কবিদৃষ্টি জীবনের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা দৃষ্টি, যেখানে সমস্ত স্পন্দনকে শব্দে ধরে মজার রস সৃষ্টি করেছেন। এত সবকিছুর মধ্যেও অন্নদাশঙ্করের ছড়ায় বিশেষত ছোটদের ছড়ায় আঙ্গিকগত দিকের অভিনব দুটি মৌল লক্ষণ চোখে পড়ার মতো। যার একটিতে রয়েছে ছড়ার মধ্যকার গল্পরস। আরেকটি আছে অভিজ্ঞতার অতিরঞ্জন। এ প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য ছড়ার নিদর্শন 'পিন্ডারী না ঠগী' ছড়াটি।

খেলার মাঠে সন্ধ্যা নামে
থামে ছেলের দল
ভগী তাদের ক্যাপটেন ,তার
বগলে, ফুটবল।
বাড়ী পথে মার্চ করে —
''চলরে চল চল।''
চলতে চলতে শ্যাওড়াতলায়
শুনতে পেল হাবু
মনিষ্যি না ভূত কে যেন
বলছে ''ইয়ে বাবু।''
আঁধারে মুখ যায় না দেখা
হাবু ভয়ে কাবু।

ভয় সকলেই কাঠ হয়ে যায়। জ্ঞানশূণ্য হয়ে দৌড়াতে থাকে। পেছনে মনিষ্যি না ভূতের অনুনয় 'ইয়ে বাবু! শালাই হ্যায়।'' সে কথা শোনার জন্য কেউ অপেক্ষা করে না। বাড়িতে এসে সকলে সবার আলোচনার বিষয় একটাই — যাকে পথের মধ্যে দেখা হলো সে কি ? — 'মনিষ্যি না ভূত' ? 'পিন্ডারী না ঠগী?' গল্পের বিপরীত প্রবাহে পরে জানা যায় যাকে দেখে সবাই বীরের মতো দৌড়ে পালিয়েছিল সে আসলে —

আমরা সেবার তরাসে যার
বীরের মতো পালাই
রাত্তিরে সে বেচে বেড়ায়
কুলফিবরফি মালাই।
হাতের কুপী নিবে গেলে
চায় সে দেশলাই

পিন্ডারী না ঠগী
(রাঙা মাথায় চিরুনী)

গল্পের আকারে, ছড়াটিতে শিশুর সামগ্রিক চেহারা ধরা পড়েছে এখানে। অন্ধকার রাত্রে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি কল্পনায় ভূত- প্রেত - দানব বা ছেলেধরা ছাড়া অন্য কিছুই না। ছড়ার সমাপ্তিতে একটা সুন্দর চমকও আমরা দেখতে পাই।

শুধুমাত্র নিটোল গল্পই তাঁর ছড়ায় চোখে পড়ে না। চোখে পড়ার মতো উল্লেখযোগ্য আরেকটি বিষয় — কাহিনীহীন একটা উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে সমাপ্তিতে নাটকীয় চমক দ্বারা গল্পরস পরিবেশনেও অন্নদাশঙ্কর সিদ্ধহস্ত। যেমন —

কেলো রে কেলো রে
এলো রে এলো রে
আয় আয় আয়।
কে এলো রে
কী এলো রে
কী হয়েছে ভাই ?
পিঁপড়েটা আমাকে
কামড়াতে চায়।
আর্তনাদ

কেলো রে কেলো রে
খেলো রে খেলো রে
হায় হায় হায়
কে খেলো রে
কী খেলো রে
খুলে বল্ ছাই

(রাঙা ধানের খই)

কাহিনীহীন ছড়াটিতে সমগ্র অংশ জুড়ে প্রচন্ড চিৎকার চেঁচামেচির পর অবশেষে জানা গেল 'পিঁপড়েটা আমাকে কামড়াতে চায়।' যা শুনে শুধু ছোটদের নয় বড়োদের ও হাসির উচ্ছ্বাস থেমে থাকে না।

মানবিক অভিজ্ঞতার অতিরঞ্জন যে কোন রচানকারীর অন্যতম অস্ত্র। ছড়াকারদের কাছে তো অবশ্যই। অন্নদাশঙ্কর রচিত শৈশবস্মৃতি ভারাক্রান্ত এরূপ ছড়ার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বেশ কিছু ছড়ায়। যেমন —

মশায়!
দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশাই!
বাঘ নয় ভালুক নয়
নয়কো জাপানী
বোমা নয় কামান নয়
পিলে কাঁপানী
মশা।
ক্ষুদ্র মশা
মশার কামড় খেয়ে আমার
স্বর্গে যাবার দশা।

কাঁদুনি (রাঙা ধানের খৈ)

এ ছড়ায় অনুপ্রাসের চমক আছে। মিলও আছে স্বতঃস্ফূর্ত, কিন্তু চমকে দেবার মতো নয়, শুধুই স্বাভাবিক। ছন্দ ও অনুপ্রাসের টানে 'কৃষ্ণনগর' 'কেশনগর' হয়ে গেছে। ছড়ার ছন্দের চার মাত্রা কোথাও তিন মাত্রায় নেমেছে। অন্নদাশঙ্করের অনেক ছড়াতেই এরকম ব্যকরণভঙ্গের উদাহরণ দেখেছেন প্রবেধচন্দ্র সেন। এবং তাঁর রচিত ছড়ার ছন্দের স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য দেখে প্রবোধচন্দ্র বলেন —'' তাঁর এই ছড়াগুলি রীতিমতো শিল্পকর্ম। খনার বচন, ডাকের বচন, ছেলে ভুলানো ছড়া ইত্যাদি। লোকসাহিত্যের ভাঙাচোরা ছন্দের রচনা, এগুলি তা নয়। এগুলির ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, সর্বত্রই শিল্পীর ছাপ ও বলার ভঙ্গিতে হাল্কা, কিন্তু ভাবে ভারী। শিল্পগুণ বজায় রেখে তিনি তাঁর রচনার ছন্দ ও বলার ভঙ্গিকে যথাসম্ভব মুখের ভাষার কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছেন।'' ৪

অন্নদাশঙ্করের ছন্দের হাতই বুঝিয়ে দেয়, এ সবই তাঁর স্বেচ্ছাকৃত। লোকছড়ার কথ্যরীতির উচ্চারণ তিনি প্রার্থনা করেন এসব ক্ষেত্রে। ছড়ার ছন্দের কথা তিনি ভেবেছেন নিজস্ব মতো। চার মাত্রায় ছড়ার ছন্দকেই তিনি মান্য করেছেন। সামান্য কিছু ব্যাতিক্রম ছাড়া, রবীন্দ্রনাথের 'তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে' কবিতার চার মাত্রার মাত্রিক পয়ার, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন পয়ারের ছিবলেমি, যাকে সুকুমার রায় প্রয়োগ করেছেন দাপটের সঙ্গে, অন্নদাশঙ্করও কখনো কখনো প্রয়োগ করেছেন এই ছন্দ। যেমন ''হৈ রে বাবুই হৈ'' — র 'জলসা' নামক একটি ছড়া।

ওই দ্যাখ আসছেন রুরু
এ বার নাচ হোক শুরু
রুরুবাবু নাচছেন
ঘুরে ঘুরে নাচছেন
সুরে সুরে নাচছেন
তালে তালে নাচছেন
তাক তাক ধিন ধিন। জলসা (হৈ রে বাবুই হৈ)

কিন্তু তাঁর রচনা কোনক্রমেই রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা'র পর্যায়ভুক্ত নয়। রবীন্দ্রত্তোর আধুনিক কবিতা থেকেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কান ও মন খোলা রাখলে দেখা যায়, এই ছন্দগুলিতে অন্নদাশঙ্করের নিজস্বতা ভীষণভাবে জ্বল জ্বল করছে।
যেমন —

তারপর কিখবর হে, তারপর কি খবর?
খবর তো জবর হে, খবর তো জবর।

এরকম ছন্দ ও বলার ভঙ্গি কোনো রচনায় পাওয়া যায় কি না এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা থেকেই যায়।

এক্ষেত্রে ভাব -ভাষা ও ছন্দের দিকে একটু মনোযোগ দিলেই বিষয়টি পরিস্কার বোঝা যায়। যেমন তার ছড়ার কয়েকটি পংক্তি -

(১) তেলের শিশি / ভাঙল বলে
খুকুর পরে / রাগ করো
তোমরা যে সব / বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে / ভাগ করো — খুকু ও খোকা (রাঙা ধানের খই)

(২) নাথুরাম তো / হানাল দেহ
হানবে এরা / মূর্তি
দেশের মুখে / কালি মেখে
ধন্য এদের / ফুর্তি — পিতৃহত্যার দ্বিতীয় দফা (উড়কি ধানের মুড়কি)

এ জাতীয় রচনায় আপাতভাবে ছড়ার সাবলীল আমেজ এবং উপভোগ্যতা থাকলেও সে সবকে অতিক্রম করে যায় - বক্তব্যের গভীরতা এবং মননের সূক্ষতা। ছোটদের আমোদ দিলেও বড়োদের করে তোলে আত্মসমীক্ষু ও চিন্তান্তিত। তাঁর এই প্রয়াস সহজেই ছোটো - বড়ো উভয়ের কাছেই গ্রহনযোগ্যতা পায়।

শৈলী ও বিষয়গত সাম্য উপভোগ করা যায় অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়ায়। এরকম পংক্তি —

এতদিন যে নাচতেছিলাম
তাক ধিনা ধিন ধিননা
বাড়া ভাতে ছাই দিল রে
কায়দে আজম জিন্না।

রাম রাজ্যবাদীর বিলাপ
(উড়কি ধানের মুড়কি)

এভাবেই নিরব স্রষ্টা প্রচার বিমুখ অন্নদাশঙ্কর স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছেন।

অতিরঞ্জনের টানে কখনো কখনো তিনমাত্রা চারে ওঠে আবার কখনো তিনে নামে এসব ভাববার অবসর দেয় না। এসব ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দরজাও যেন বন্ধ হয়ে যায় আপনা আপনি। একে তো শিশুর কাছে অসম্ভব কিছু নেই, তার ওপর অতিরঞ্জনের চাপ, যেমন —

পিঁপড়েরা কেন এত ভালোবাসে
আমাকে আমাকে আমাকে!
ভালোবাসে না তো মাসীকে, মামীকে, মামাকে!
মানুষটা আমি এতই কি বলো
মিষ্টি, এতটা মিষ্টি!
আমারি ওপর কেন যে ওদের দৃষ্টি।
যে সব মিষ্টি খেয়েছি জীবনে
এই বুঝি তার প্রতিশোধ!
কামড় দিয়েছি, কামড়েই তার শোধবোধ! পিঁপড়ে(ডালিম গাছে মৌ)

অন্নদাশঙ্করের ছড়ায় মানবিক অভিজ্ঞতার অতিরঞ্জন ও গল্পরসকে নিগূঢ় তাৎপর্য পৌঁছে দেয় ছন্দমিল ও শব্দে বর্ণিত ধ্বনি ও ছবি। এই ধ্বনি ও ছবি কখনো কখনো আলাদাভাবে অসামান্য ছড়ার জন্ম দেয়। যেমন —

এই ছোকরা
আলুবখরা
আখরোট কিসমিস
চার পয়সায়
যা নিয়ে আয়
না আনলে, ডিসমিস। হুকুম(হৈ রে বাবুই হৈ)

সামান্য কিছু কিছু শব্দ কিভাবে আশ্চর্য অশ্চর্য ছড়ার জন্ম দেয়, এই ছড়াটি তারই চূড়ান্ত নিদর্শন। আবার ধ্বনিস্পন্দের সঙ্গে ছবি মিলিয়ে অন্নদাশঙ্কর কীভাবে আশ্চর্য সব ছড়া রচনা করেন - এরকম একটি ছড়া -

ভিড় দেখলে ভিড়ে যাবি
ঠোঙায় চিনে বাদাম খাবি।
শুনবি যখন ‘গোল’ ‘গোল’
তুইও দিবি হরিবোল।
শুনিস যদি ‘পুলিশ’ ‘পুলিশ’
তুই ও তখন বাপ মা ভুলিস।
দৌড় দৌড় দৌড় দৌড়
কোথায় গঙ্গা কোথায় গৌড়

খেলার মাঠ (রাঙা মাথায় চিরুনি)

ছড়াটিতে ধ্বনিস্পন্দে একটা ছবি ফুটে উঠল খেলার মাঠের, সেই সঙ্গে সাধারণ বাঙালির মানসিকতাও বোঝা যায়। ব্যাঙ্গ আছে কিন্তু এতো ঝাঁঝহীন ও গোপন যে আঘাতের চেয়ে মজাই বেশি উদ্বেল হয়ে ওঠে। এখানেই অন্নদাশঙ্করের অবাধ বিচরণ ছড়ার রাজ্যে।

অন্নদাশঙ্করের মতো লেখক যাঁর মননশীলতায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার উদ্ভাস, সারাজীবনের সাধনা যার, তেমন কোন বিষয় পেলে ঝলসে ওঠা- তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই তাঁর রচিত ছড়ার মধ্যে। ছড়ার মজা বজায় রেখে হিন্দি বাংলার মিশ্রণ ঘটিয়ে ছড়ার লঘু মেজাজকে, কতখানি সিরিয়াস আমেজে পৌঁছে দেওয়া যায় সেরকম একটি ছড়া —

গামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই।
আফ্রিকার পায়ে বেড়ি নাই।
খাল কেটে যে কুমির হল ডাকা
ভেবেছিল খালটা ওদের পাকা।
ঘুরিয়ে দিল ইতিহাসের চাকা
কুমীরগুলোর গুমোর হল ফাঁকা।
এবার ওরা মারবে বুঝি ঘাই
গামাল, তুনে কামাল কিয়া ভাই।

কুমীর বিদায়(উড়কি ধানের মুড়কি)

অন্যদিকে দেশবিভাগে যে কি কাঁটার মতো বিঁধে আছে আমাদের মনে, তা কোন সচেতন মানুষই অস্বীকার করতে পারেন না। অন্নদাশঙ্করও পারেননি। যদি কখনো দুই বঙ্গ আবার জুড়ে যায়, যদি ফিরে যেতে পারে ছিন্নমূল মানুষেরা নিজ নিজ স্থানে, সেটাই হবে জীবনের সবচেয়ে স্বস্তির। সে কথাই অন্নদাশঙ্কর তাঁর ছড়ায় নিয়ে এসেছেন —

মোচ্ছব
আহা মোচ্ছব
দেব মোচ্ছব আমি সত্য
যদি পাকিস্তানের
দ্বার খুলে দেন
আয়ুব চক্রবর্তী।

যদি ফিরে যায়
আহা ফিরে যায়
ঘরে ফিরে যায় উদ্‌বাস্তু।
ওহো তেরো বৎসর
আগে ছিল যথা।
পুনরবার তথাস্তু।
ওঁ তথাস্তু ।
ওঁ তথাস্তু ।

কালস্য কুটিলা গতি
(উড়কি ধানের মুড়কি)

আয়ুব খান শুধু দুই দেশের মধ্যে চলাচলকে সহজসাধ্য করে দিয়েছিলেন , তাতেই এই মানসোল্লাস। কিন্তু এ কি শুধু উল্লাস না কি পুঞ্জীভূত বেদনার উৎসের দ্বার খুলে দেওয়া ? অন্নদাশঙ্কর এই বেদনার যন্ত্রণাময় চিত্রগুলিই একজন মননশীল সামাজিক মানুষ হিসেবে তুলে ধরেছেন বস্তুভাবের যথাযথ বর্ণনা দিয়ে, আর এই বস্তুর স্বাভাবিক বর্ণনা থেকেই মজার রসে উত্তীর্ণ হয়েছেন ধ্বনিমিলের চমৎকার সমন্বয়, যা তাঁর ছড়ার স্বকীয়তা।

অন্নদাশঙ্করের ছড়ায় 'ভাষিক' প্রয়োগে একজন সুদক্ষ শিল্পীর শিল্পকর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। ছড়াগুলিতে শিল্প জগতের বিচিত্র ভাষাকেন্দ্রিক প্রক্রিয়ার আমদানি করেছেন। শিশুদের ঝগড়ায় শিশুদের মতো শব্দক্রীড়া ও শব্দবিকৃতি ঘটিয়েছেন ছড়ায়। যেমন —

এক যে ছিল পার্বতী
ফার্বতী
মার্বতী
ধার্বতী
তার যে ছিল বেড়ালটা
ফেরালটা
ভেড়ালটা
মেড়ালটা — পার্বতীর ছড়া (ডালিম গাছে মৌ)

আলোচ্য ছড়াতে 'ফার্বতী', 'মার্বতী', 'ধার্বতী', ফেরালটা', ভেড়ালটা', মেড়ালটা', এগুলি সবই শিশুদের উপযোগী শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে ছড়াকে শিশুদের উপযোগী করে তুলেছে। আবার শিশুদের খেলার ছন্দে রচিত ছড়া —

টাট্টু ঘোড়া! টাট্টু ঘোড়া!
নাকে পড়াই দড়ি
রুমাল পেতে রাখি পিঠে
লাফ দিয়ে চড়ি!
কদম চালে চলো ঘোড়া
গড়িয়ে না পড়ি! — ছোট্ট ঘোড় সওয়ার (রাঙা মাথায় চিরুনি)

অন্নদাশঙ্কর তাঁর ছড়ায় বাগধারা নিয়েও মজার ছড়া নির্মাণ করেছেন। বাংলা বাগধারাকে ছড়ায় কিভাবে গ্রহনযোগ্য করে তোলা যায় অন্নদাশঙ্কর তা তুলে ধরেছেন গঠনগত দিক থেকে। যেমন —

পটল নামে লোকভালো
পটল চেরা চোখ ভালো।
পটল খেতে ভালো যে
কিন্তু পটল তুলবে কে ?

ছড়াতে শিল্পগুণ বজায় রেখে তিনি তাঁর রচনার ছন্দ ও বলার ভঙ্গিকে যথাসম্ভব মুখের ভাষার কাছাকাছি নিয়ে গেছেন। 'পটল' নামক শব্দটি দিয়ে রঙ্গরসে মজা শুধু শিশুকেই নয় বড়োদের মাতিয়ে তুলেছেন।

ছড়ার রাজ্যে সম্ভব অসম্ভবের সীমানা কাঁটাতার চিহ্নিত নয়, ফলে শিশুর বিস্ময় শিশুর আনন্দ কোন ও কার্যকারণে গাঁথা নয়, অথচ একটা অপূর্ব কৌতুক শিশুর চোখে নেচে ওঠে এই ছড়ার স্বপ্নরাজ্যে। তাই কোনকিছুই ছড়ায় ব্রাত্য নয়। বহুকাঙ্ক্ষিত প্রবাদ ও ছড়ায় স্থান পেয়েছে। যেমন —

রবিবারে জন্মায়
কবি বলে যশ পায়।
সোমবারে জন্ম
তার হয় ধন্ম।
মঙ্গলবারে জাত
বীর বলে বিখ্যাত
জন্ম কি বুধবার?
বুদ্ধিটি ক্ষুরধার। ভাগ্য (হৈ রে বাবুই হৈ)

এরকম অপর একটা ছড়া —

লেখা পড়া করে যে
মোটর গাড়ি চড়ে সে।
খেলাধূলা করে যে
বিশ্বকাপে লড়ে সে
নাচগান করে যে
যশ পায় পরে সে। কে কী হবে (দোল দোল দুলুনি)

লোকসাহিত্যের অন্যতম একটি শাখা প্রবাদ। গ্রাম্যপ্রবাদ যেগুলি লোকমুখে সর্বদা বিরাজমান সমাজে সেগুলিকে নিয়ে অন্নদাশঙ্কর ছড়া রচনা করেছেন। যেগুলি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো এক একটি কথার টানে প্রাসঙ্গিকতা পায় সমাজে। এই দূরুহ কর্মকে অন্নদাশঙ্কর অনায়াসে হাজির করেছেন। যে কারণে তাঁর ছড়া হয়ে ওঠে ক্রমাগত চতুঃসীমায় উত্তীর্ণ। শুধুমাত্র মস্তিষ্কচর্চাই নয়, এগুলিতে হৃদয়অনুভূতি মূল্যও যথেষ্ট। যেমন —

বারো রাজপুত তেরো হাঁড়ি
নিত্য করে মারামারি।
মোগল এল ঐক্য এলো
মোগল গেল, ঐক্য গেল,
রাজপুতানী ভাগের মা
গঙ্গা পাওয়া ঘটল না।
এখন শুনি নতুন সূত্র
গঙ্গা নয় ব্রহ্মপুত্র।

ছড়াটির অন্তরঙ্গে দুর্লক্ষ্য ইঙ্গিত আছে। আবার রূপের দিক দিয়ে রসগ্রহীতা রয়েছে অপরীসীম। বহু প্রচলিত প্রবাদ ছড়াতে ব্যবহৃত হয়ে ব্যবহারিক দিকটিও মূল্য পেয়েছে। যে কারণেই অন্নদাশঙ্করের ছড়া সকল পাঠকের সামনেই একটি আলাদা মাত্রার দরজা ঘুলে দেয়।

অন্নদাশঙ্কর শুধু প্রাবদকে নিয়েই ছড়া রচনা করেননি। তাঁর ছড়াতে আমরা দেখতে পাই ধাঁধারও পরিচয়। যেমন -

কে যেন বলেছিল, ''ঠিক ঠিকই?''
টিকটিকি ! টকটিকি ! টকটিকি !
কার যেন কে ছিল বাবর শা ?
মাকড়শা! মাকড়শা! মাকড়শা!
কে যেন চুষে খায় কার খোকা ?
ছারপোকা ! ছারপোকা ! ছারপোকা !
সাবাড় করে কে খায়ে চাল চুলা?
আরসুলা ! আরসুলা ! আরসুলা ! ধাঁধাঁ (হৈ রে বাবুই হৈ)

ধাঁধার প্রশ্ন এবং উত্তর ছড়ায় ব্যবহার করে অন্নদাশঙ্কর তাঁর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। লঘুভাবের বাহন রূপে ছড়া এতদিন প্রধানত শিশুমনকেই আনন্দ দিয়ে এসেছে। প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করে ছড়ার ছন্দকে সাধু সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু ছড়া থেকে গেল অবহেলিত, তার পূর্বের রূপ নিয়েই। তার শক্তি রইল অনাবিস্কৃত। এই অনাদৃত ছড়ার শক্তি ও সৌন্দর্য্যের উপযোগিতা উপলব্ধি করলেন অন্নদাশঙ্কর। ছড়ায় অন্তর্নিহিত বাংলা ভাষার প্রকৃতি ও শক্তিকে গভীরভাবে বাহনরূপে যথোচিত মর্যাদা দিয়ে তাকে সাধুসাহিত্যের আসরে আসন দিলেন অন্নদাশঙ্কর। যেখানে সমস্ত উপভোগ্যতা অতিক্রম করে যায় সাবলীল আমেজ ও বক্তব্যের গভীরতা, তাই ধাঁধাকে নিয়ে তিনি রচনা করতে পারেন আশ্চর্য ধরণের ছড়া। যেমন —

ধাঁধার জবাব আছে এটুকু জানি
জানিনে কিন্তু কোথায় লুকোনো আছে।
ধাঁধার জবাব পাবই এটুকু জানি
জানিনে কিন্তু কবে পাব কার কাছে। অজানা (দোল দোল দুলুনি)

অন্নদাশঙ্কর শব্দ নিয়ে কাটাকুটি বা ছবি আঁকার খেলা ছড়ার মাধ্যমে অবারিত, অনর্গল ,অসংকোচে সম্মানের স্থানে তুলে ধরলেন। যেমন —

লেখো দেখি বাঘ।
বাঘ।
বকেটে ছ করো
ঘ কেটে গ করো
হয়ে যাক ছাগ।
বাঘ, তুই ভাগ।
লিখেছ তো ছাগ
ছাগ কাটাকুটি খেলা (আতা গাছে তোতা পাখি)

শব্দ নিয়ে খেলা শিশুদের মনে ভীষণভাবে প্রভাব পড়ে। একদিকে ছড়ার মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষাদান, অপরদিকে শিশু মনোরঞ্জনের উপরি পাওনা উভয়দিকেই গুরুত্ব পায় শিশুদের কাছে। এরকম ভবেই অন্নদাশঙ্কর সৃষ্টি করেছেন নিজস্ব ভাবানুভূতির মননের সূক্ষ্মতা। তাঁর এরকম অপর একটি ছড়া —

চকখড়ি চকখড়ি চাক
এইবার আঁকব কাক!
কাক নয় সাদা, তাই হাঁস
হাঁস হলো হাঁস হলো - বাস ছবি আঁকা (ডালিম গাছে মৌ)

অন্নদাশঙ্কর শব্দকে নিয়ে কাটাকুটির খেলা, ছবি আঁকা, বিভিন্ন শিশু শিক্ষার মাধ্যম গুলিকে মজার রসে উপস্থাপন করেছেন। স্বভাবতই এগুলি শিশুদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। যা অন্নদাশঙ্করের ছড়ায় আঙ্গিকগত মৌলিক প্রতিভা।

আবার এরকমভাবে সন্ধি ও শব্দবিশ্লেষের খেলাও অন্নদাশঙ্করের ছড়ায় আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। যেমন —

একহাতে বাজে না তালি
গালার সঙ্গে আছে গালি।
মারার সঙ্গে আছে মারি
কাড়ার সঙ্গে আছে কাড়ি।
কাটার সঙ্গে আছে কাটি
লাঠার সঙ্গে আছে লাঠি। এক হাতে বাজে না তালি (রাঙা মাথার চিরুনি)

আবার কখনো বাংলা ‘ব্যকরণ’ কে নিয়ে মজার রসে ছড়া রচনা করেছেন এরকম একটি দৃষ্টান্ত —

গোঁয়ার আমি, গোঁয়ার তুমি
করছি দাদা, গোঁয়ার্তুমি।
বাঁদর তুমি বাঁদর আমি
করছি ভায়া বাঁদরামি। ব্যকরণ (হৈ রে বাবুই হৈ)

‘গালাগালি’, ‘মারামারি’, কাড়াকাড়ি’, ‘লাঠালাঠি’, গোয়ার্তুমি, বাঁদরামি ইত্যাদি শব্দকে নিয়ে ছন্দ ও মিলের সহযোগে ছড়াকে করে তুলেছেন সহজ সরল। বাংলা ভাষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ ধ্বনিপ্রকৃতি ধরা পড়ে তাঁর ছড়ায়। অন্নদাশঙ্করের অনেক ছড়াই এক একটি হীরকখন্ডের মতো ঝকঝক করে ছন্দ ও মিল এই গুণের আভায়।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করে কৌতুকতা অতিক্রম করে গূঢ় জীবন সত্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর ছড়াতে। তাঁর এরকম ছড়ার নিদর্শন —

গোরুর গাড়ির দুই গরু ছিল
ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।
কে যে পরাধীনে কী বুদ্ধি দিল
ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।
অধেমরা দুই নির্বোধ প্রাণী
ধে রে তাকতাক ধিন ধিন। গৃহযুদ্ধ (উড়কি ধানের মুড়কি)

অন্নদাশঙ্করের এই ধরণের ধ্বনির অনুকরণ ছোটদের ছড়ায়ও ব্যবহার হয়েছে প্রচুর পরিমানে। যেমন —

ঘ্যাঁগো ঘ্যাঁগো ঘ্যাঁগো
করছে যেটা ব্যাঙ্ ও।
গলা ছেড়ে চ্যাঁচা
লোকে বুঝুক পেঁচা। ঘ্যানঘ্যানানি (রাঙা ধানের খৈ)

অপর আরেকটি ছড়া —

ব্যাঙ বললেন ব্যাঙাচ্চি,
দাঁড়া তোদের ঠেঙাচ্চি।
তা শুনে কয় ব্যাঙাচ্চি,
আমরা কি, সার ভ্যাঙাচ্ছি? ব্যাঙের ছড়া (ডালিম গাছের মৌ)

এইরকম ‘খপাখপ’, ‘টপাটপ’, ‘কপাকপ’, গপাগপ’, ‘হা হা’, ‘ঠং ঠং’, ‘ডিং ডিং’, ‘টগবগ’, ‘কুরকুর’, ‘গুড়গুড়’, অজস্র ধ্বনিরূপ ব্যবহার করে ছোটদের আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। ধ্বনির এই রূপায়ন, কিংবা অজস্র পুনরাবৃত্তি ছড়ার দেহে সৌন্দর্য ও রঙ্গ তৈরী করে। পুনরাবৃত্তি অন্নদাশঙ্করের প্রিয় একটি বিষয়। শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে তাঁর রচিত ছড়া —

কেলো রে কেলো রে
এলো রে এলো রে
আয় আয় আয়।
কে এলো রে
কী এলো রে
কী হয়েছে ভাই ? আর্তনাদ (রাঙা ধানের খৈ)

অথবা —

কে বাঁচাবে আমার মাথা।
ছাতা আমার, আমার ছাতা।
ও ছাতা তোর পায়ে পড়ি
বর্ষাতে তুই আমার ত্রাতা। ছাতা (আতা গাছে তোতা)

ছড়া গুলির মধ্যে হাসি এসেছে দুটি কারণে — প্রথমতঃ শব্দ প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যে, দ্বিতীয়তঃ রচনার দক্ষতায়। সমষ্টির ঝংকার সৃষ্টি করে শব্দগুলি কৌতুকাবহ হয়ে উঠেছে। সকলের কাছেই যেগুলি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

শুধু পুনরাবৃত্তিই নয়, তাঁর ছড়াতে রয়েছে সমান্তরালতা শব্দ প্রয়োগের নৈপুণ্যতা যে কারণেই তাঁর ছড়া স্বকালের সীমানা পেরিয়ে ভাবীকালের উত্তরণে পৌঁছে যায় অনায়াসে। সমান্তরালতা দেখা যায় তাঁর বেশ কিছু ছড়ায়। যেমন —

ভবী কখনো ভোলে ?
না
হাতী কখনো ঢোলে
না
তিমি কখনো ঝোলে
না কখনো না (হৈ রে বাবুই হৈ)

এরকম অপর আরেকটি ছড়া —

হবুচন্দ্র রাজার ছিল
হাতি হাজার হাজার, ছিল
ঘোড়া হাজার হাজার, ছিল
হবুগঞ্জ বাজার ছিল
দোকান হাজার হাজার ছিল হবুচন্দ্র রাজার (আতা গাছে তোতা)

অন্নদাশঙ্করের ছড়ার গঠনকাঠামো বিচিত্র। উপমা প্রয়োগ করে ছড়ায় তিনি অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন —

এরকম একটি ছড়া —

যেমন

নিজের নারীর চাইতে প্রিয় পরের নারী
বাপের বাড়ীর চাইতে প্রিয় শ্বশুরবাড়ী
তেমনি
কর্মকাজের চাইতে প্রিয় ধর্মঘট
মিছিল করে রাস্তা জুড়ে ট্রাফিক জট। উপমা (যাদু এ তো বড় রঙ্গ)

এভাবেই অন্নদাশঙ্করের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে শিশুদের নিয়ে, শিশুদের মনের মতো করে নিজের ঘনিষ্ঠ যোগ দেখিয়ে নিজের রচনায় মগ্ন থেকেছেন। যেখানে বিমূর্ত হয়েছে স্বদেশ, ধ্বনিতে চিত্র এবং সনাতন ঐতিহ্যের অবগাহন। আর এই অবগাহনই শিশুর ভালোবাসার প্রথম পাঠ। যা তাঁর মননশীলতা ও কবিকল্পনার মেলবন্ধনে বাংলাদেশের জীবন রসে পুষ্ঠ হয়ে নতুন মাত্রা পেয়েছে।

(১) রায় অন্নদাশঙ্কর ঃ ছড়াসমগ্র, ১ম প্রকাশ ১৯৮৫, বাণীশিল্প, কলকাতা - ৭০০০০৯

(২) রায় অন্নদাশঙ্কর ঃ ছড়াসমগ্র, ১ম প্রকাশ ১৯৮৫, বাণীশিল্প, কলকাতা - ৭০০০০৯

(৩) রায় শিবনারায়ন ঃ বিবেক শিল্পী অন্নদাশঙ্কর, ডি.এম. লাইব্রেরি, ১৯৮৫ কলকাতা - ৬, পৃঃ ৭৫

(৪) রায় শিবনারায়ন ঃ বিবেক শিল্পী অন্নদাশঙ্কর, ডি.এম. লাইব্রেরি, ১৯৮৫ কলকাতা - ৬, পৃঃ ৭৫